IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসে নারী, নদী ও নিঃসঙ্গতার বহুস্বরিক পাঠ: সাহিত্যিক, নারীবাদী, সমাজতাত্ত্বিক ও দার্শনিক বিশ্লেষণ

ড. মোঃ সিদ্দিক হোসেন

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বঙ্গবাসী মর্নিং কলেজ

১৯, রাজকুমার চক্রবর্তী সরণি, কলকাতা -৭০০০০৯

ORCID: https://orcid.org/0009-0008-3912-7101

Google Scholar: https://share.google/lLkxmTLdM9D2wFhg8

Email: mdsh803@gmail.com

মোবাইল নং : 9475023803

সারসংক্ষেপ (Abstract):

অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস একটি নদীর নাম কেবল একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনের প্রতিচিত্র নয়, বরং এক বহুমাত্রিক মানবিক ট্র্যাজেডির সাহিত্যিক অনুবাদ। এ উপন্যাসে নারী, নদী ও নিঃসঙ্গতা হয়ে ওঠে সমাজচ্যুত অস্তিত্বের প্রতীক। মাতৃত্ব, প্রেম, স্বপ্নভঙ্গ ও আত্মপরিচয়ের সংকট—এই সব কিছুর আন্তঃসম্পর্ক নির্মিত হয়েছে এক ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে। বাসন্তী, অনন্তের মা ও অনন্তবালা—তাঁরা কেউই কেবল ‘চরিত্র’ নন, বরং তাঁরা বাঙালি নারীর আত্মবিসর্জিত জীবনের নিঃশব্দ প্রতিরূপ। কিশোর ও অনন্ত চরিত্রে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভাঙন ও যন্ত্রণার বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায়। নদী ও নারী একে অপরের সহাবস্থানে দাঁড়িয়ে—একদিকে সংস্কৃতির ধারক, অন্যদিকে শূন্যতার প্রতিচ্ছবি। এই গবেষণায় উপন্যাসটির সাহিত্যিক গুণ, নারীবাদী পাঠ, সমাজতাত্ত্বিক গভীরতা ও দার্শনিক প্রশ্ন বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির অন্তর্লীন ফাঁক মানবজীবনের শাশ্বত ব্যর্থতার অনুরণন হয়ে ওঠে।

সূচক শব্দ (Keywords): নারীবাদ, মাতৃত্ব, আত্মপরিচয়, নদীপ্রতীক, প্রান্তিকতা, সাংস্কৃতিক অবক্ষয়, নিঃসঙ্গতা।

ভূমিকা (Introduction):

বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে তিতাস একটি নদীর নাম এক অনন্য স্থান অধিকার করে, যেখানে আঞ্চলিক জীবনের প্রেক্ষাপটে নারী-অস্তিত্বের বহুস্তরীয় ট্র্যাজেডি শিল্পসুষমায় রূপ পেয়েছে। এই উপন্যাসে নদী যেমন বাস্তবতার প্রতীক, তেমনি তা হয়ে উঠেছে জীবনের রূপক, যেখানে নারী চরিত্রেরা বারবার স্বপ্ন দেখে, ভাঙে, আবার অপেক্ষা করে। অনন্তের মা, বাসন্তী ও অনন্তবালা—তাঁদের জীবনের ব্যর্থতা একক না হয়ে হয়ে দাঁড়ায় একটি গোটা সমাজের অস্তিত্ব সংকটের দলিল। উপন্যাসটি শুধু সাহিত্যের নিরিখে নয়, বরং নারীবাদী, সমাজতাত্ত্বিক ও নৃবিজ্ঞানভিত্তিক পাঠে বিশ্লেষণযোগ্য এক অন্তঃসত্তার দর্পণ। এই গবেষণার মাধ্যমে সেই সত্তাকে অন্বেষণ করার প্রয়াসই মূল লক্ষ্য।

- **প্রান্তিক জীবনের জীবনছবি ও আঞ্চলিক উপন্যাসের অন্তর্লোকে:**

সাহিত্য কেবল নাগরিক জীবনের আয়না নয়; তা হয়ে ওঠে সমাজের নীরব, বিস্মৃত প্রান্তিক সত্তার আত্মঘন প্রতিবিম্ব। এখানেই উপন্যাস তোলে মৌল এক প্রশ্ন—“এই জীবন কাদের?” (মল্লবর্মণ, ২০১৪) যার উত্তরে উদ্ভাসিত হয় প্রান্তবাসীর ইতিহাস-সংলগ্ন অস্তিত্বসংকট।

এই ধারা বাংলা সাহিত্যে ‘আঞ্চলিক উপন্যাস’ নামে পরিচিত, যেখানে ভূগোল নয়, বরং ইতিহাস, সংস্কৃতি ও চেতনার অন্তর্গত রূপান্তরই মুখ্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মা নদীর মাঝি’, তারাশঙ্করের ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’, সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’ এবং পরবর্তীকালে

অদ্বৈত মল্লবর্মণের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’—এই ধারার শিখর। ‘তিতাস’ ত্রিপুরার তীরবর্তী মালো জনজীবনের নিঃশব্দ ইতিহাস, যা লেখকের আত্মভূমির অন্তর্জ অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত।

এই আখ্যানের কেন্দ্রবিন্দুতে কোনো একক নায়ক নেই; বরং সামষ্টিক মালো সমাজের অস্তিত্ব ও সংকটই এর প্রাণভোমরা। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়—

> “লেখক যেন এখানে কোনব্যক্তির কাহিনিকে ধারণ করতে চান না। নদীর যেমন বিশেষের প্রতি কোন পক্ষপাত নেই, কাহিনীও তেমনি এখানে বিশেষ কিছুর ঘাটে বাঁধা নয়।” (মল্লবর্মণ, ২০১৪)

এখানে চরিত্রেরা নদীর স্রোতের মতো—চলমান, ছায়াভাসমান, অথচ আলাদা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘মানুষের ধর্ম’-এ বলেন—

> “মানুষ কোনো গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চায় না; সে আপন জীবনকে বিস্তার দিতে চায়।”

এই বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা ‘তিতাস’-এ অনুরণিত হয়, যেখানে নদী হয়ে ওঠে নিয়তির প্রতীক। তবে ‘পদ্মা নদীর মাঝি’-তে নদী যেখানে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের প্রতীক, ‘তিতাস’ সেখানে এক হারাতে বসা সংস্কৃতির অন্তরশোক। জীবনানন্দ দাশ যেন এই অনুভবকেই চিত্রায়িত করেছেন—

> “অন্তরাল ছুঁয়ে যাই / পলাশের রক্তাক্ত স্বপ্নের ভিতর দিয়ে।” (মল্লবর্মণ, ২০১৪)

এই অন্তরালের সন্ধানেই ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ হয়ে ওঠে বাংলা কথাসাহিত্যে প্রান্তিক জীবনের অন্তর্লিখনের এক শিল্পময়, ঐতিহাসিক কাব্যরূপ।

- **প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ফল্গুধারা — তিতাসপারের মালোজীবনের অন্তর্লিখন:**

অদ্বৈত মল্লবর্মণের *তিতাস একটি নদীর নাম* শুধু একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাহিনি নয়, বরং এক বিস্তৃত মানবজীবনের প্রতিচিত্র। মালো সমাজের সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহ, ও অস্তিত্বসংকটের মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে মানুষের চিরন্তন দ্বন্দ্ব—প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির। লেখক তাঁদের জীবনের অভ্যন্তরস্থ স্তরে প্রবেশ করে এমন এক জীবনদর্শনের রূপায়ণ করেছেন যেখানে “মানুষ চায় এক, আর বাস্তবে হয় যেন আর এক।”(মল্লবর্মণ, ২০১৪)

এই বৈপরীত্য একটি অনঃসলিলা বেদনারূপে ধরা দেয়, যা উপন্যাসের নীরব অন্তঃসুর। “এক করুণ ট্র্যাজিক সুর যেন আমাদের বহমান জীবনের আপাত আনন্দমুখরতার অন্তরালে অনঃসলিলা ফল্গুধারার মতোই সদা বহমান। (চট্টোপাধ্যায়, ২০০৭, পৃ. ১৯০–১৯১)”[3] এই অন্তর্লীন সুর বাংলা কথাসাহিত্যের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে, যেমন রবীন্দ্রনাথের ‘চোখের বালি’ ও ‘নষ্টনীড়’-এ, যেখানে মনের আকাঙ্ক্ষা ও জীবনের বাস্তবতার সংঘর্ষ এক গূঢ় কাব্যিকতায় মূর্ত হয়েছে।

তেমনি, তিতাস নদীর প্রেক্ষাপটে মল্লবর্মণও নির্মাণ করেছেন এক মানবিক মহাকাব্য, যেখানে নদী কেবল ভূগোল নয়, অস্তিত্বের রূপক। যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি-তে কুবেরের জীবনে নদী রুটি ও সর্বনাশের উভয় প্রতীক, তেমনি তিতাসও জীবনধারণ ও সামাজিক ভাঙনের দ্বৈত প্রতিচ্ছবি। উপন্যাসের একটি পরিপূর্ণ পাঠে স্পষ্ট হয় যে, নদী শুকিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মালোদের জীবনের স্বরূপও ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে—“তিতাসের জল শুকিয়ে যাওয়াকে ঘিরে তিতাস নির্ভর মালোসম্প্রদায়ের অস্তিত্বের সমস্যা আর মালোদের নিজস্ব সংস্কৃতির অবক্ষয়কে ঘিরেই মূলত তৈরি হয়েছে এই সংকট। (মল্লবর্মণ, ২০১৪, পৃ. ২২৫)”

এই সংকট কেবল পরিবেশগত নয়, বরং এক সামগ্রিক সাংস্কৃতিক বিপর্যয়। গান, লোকাচার, জীবিকা ও সামাজিক সংহতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজ যখন নদী হারায়, তখন হারায় তার আত্মপরিচয়ও। এইভাবেই মল্লবর্মণ প্রত্যাশা-প্রাপ্তির দ্বন্দ্বকে কেবল ব্যক্তি-মানসিকতার নয়, বরং একটি গোষ্ঠীর অস্তিত্বসঙ্কট হিসেবে চিত্রিত করেছেন—এবং সেখানেই তাঁর সাহিত্যিক বিশিষ্টতা।

- **প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির করুণ ছন্দে: কিশোর ও অনন্তের মাতৃসত্তার জীবনে নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস:**

অদ্বৈত মল্লবর্মণের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ কেবল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আখ্যান নয়—এ এক ট্র্যাজিক মানবজীবনের দর্পণ, যেখানে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির সংঘর্ষ প্রতিটি চরিত্রের গভীরতর অভ্যন্তরে অনুরণিত হয়। এই দ্বন্দ্বের শৈল্পিক প্রকাশ লক্ষ করা যায় কিশোর এবং অনন্তের মা চরিত্রে, যাঁদের জীবনে জীবন-আকাঙ্ক্ষা ও অপূর্ণতার করুণ অভিঘাত বিধৃত হয়েছে এক নৈঃশব্দ্যভরা রূপকে।

‘কিশোর’—এক রোমান্টিক, স্বপ্নদ্রষ্টা কিশোর, যার হৃদয় সাড়া দেয় “অজানার মায়াবী আহ্বানে”। নদী তার কাছে নিছক জীবিকা নয়, এক গূঢ় নন্দনতত্ত্বের উৎস। সে ভালোবাসে সেই নারীকে, যাকে সে চেনে না, কারণ তার প্রেমদর্শনে—“বিবাহ করা যায় তাকে,

যাকে মন কোনওদিন জানেনি, চেনেনি।" এ এক কাব্যিক, অচেনার প্রতি আকর্ষণের অনুপম সুর। অথচ সে যখন সেই অনামা নারীকে বিবাহ করে, তখনও জানে না, এ আনন্দ এক নিষ্ঠুর নিয়তির পূর্বকথা। ডাকাতদের হাতে সদ্য বিবাহিত স্ত্রীর অপহরণে সে চিরতরে হারায় প্রেম ও নিজেকে—রূপান্তরিত হয় এক উন্মাদে, এক ভাগ্যাহত ক্রীড়ানকে।

এই ট্র্যাজেডি যেন নিছক ব্যক্তিগত নয়—তা এক বহুমাত্রিক ভাঙন, এক অন্তর্জাগতিক মৃত্যু। এখানে রবীন্দ্রনাথের 'চারুলতা' কিংবা শরৎচন্দ্রের 'নিরুপমা' চরিত্রদের মতই সামাজিক সীমাবদ্ধতা আর একাকিত্বের অভিঘাত ধরা পড়ে—তবে কিশোরের যন্ত্রণার গভীরতা তাৎক্ষণিক, হঠাৎ বিস্ফোরণের মতো।

অন্যদিকে, 'অনন্তের মা' ও নিঃসঙ্গতার প্রতীক। মাতৃত্বের পূর্ণতা তাঁকে স্পর্শ করলেও সমাজ ও নিয়তি তাঁর কাছ থেকে তা কেড়ে নিয়েছে। কিশোর, অনন্তের মা কিংবা বাসন্তীর জীবনে এই অপূর্ণতা এক গোপন কান্না হয়ে প্রবাহিত—এক "দীর্ঘ নদীর মতো, যেখানে সুখ আসে ক্ষণিকের ঢেউ হয়ে, আর দুঃখ প্রবাহিত হয় অন্তহীন স্রোতে।"

এইভাবেই উপন্যাসে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির সংঘর্ষ শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি নয়, বরং এক অস্তিত্ববাদী জীবনদর্শনের প্রতিফলন—যেখানে স্বপ্ন, স্মৃতি ও বাস্তবতা মিলে গড়ে ওঠে এক অনবদ্য করুণ মহাকাব্য।

- **ভাগ্যবিড়ম্বিত প্রেম ও আত্মনিষ্ঠ প্রত্যয়:**

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে অনন্তের মা যেন এক অন্তর্লীন ট্র্যাজেডির জীবন্ত প্রতিমূর্তি—এক জীবনের পরম প্রতীক্ষা ও নিঃসঙ্গতার নীরব কাব্য। বিবাহসূত্রে সংসারে প্রবেশ করলেও কিশোরের প্রেম ও দাম্পত্যের পরিপূর্ণতা তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি। ডাকাতদলের হাতে অপহরণ এবং জেলেপাড়ার আশ্রয়ে তাঁর দিনগুলি যেন এক অবিরাম অভাব, অপূর্ণতা ও প্রেমতৃষ্ণার অধ্যায়, যেখানে "মৃত্যুর মুখ থেকে ফেরা" কোনো নতুন জন্ম নয়, বরং এক নিরব বিসর্জনের শুরু।

এই প্রেম ছিল কেবল শরীরঘনিষ্ঠ নয়, বরং আত্মিক। বহু বছর পর স্বামীকে ফিরে পাওয়ার আশায় তিনি যখন শ্বশুরবাড়িতে ফিরে আসেন, তখন আবিষ্কার করেন—গ্রামে ঘুরে বেড়ানো পাগলটি-ই কিশোর। এই ভয়ানক সত্যেও তিনি ভেঙে পড়েন না, বরং প্রিয়জনের পুনর্জাগরণে নিজেকে উৎসর্গ করেন।

এই আত্মনিষ্ঠ সংকল্পের এক নিখাদ প্রকাশ মেলে তাঁর হৃদয়ভেদী সংলাপে—

"তুমি তো তার মনের মানুষ মিলাইয়া দিতে পার না। (মল্লবর্মণ, ২০১৪)

তা পারি না! তবে চেষ্টা কইরা দেখতে পারি, আমি নিজে তার মনের মানুষ হইতে পারি কিনা।"

এই বাক্য নারীর আত্মপরিচয়, প্রেম, এবং প্রত্যয়ে ভরসা রাখা এক বিপুল মানসিক শক্তির প্রতীক। এটি আত্মত্যাগ নয়, বরং আত্ম-উজ্জ্বলতা। এই প্রেম প্রথার বাইরে, আত্মার গভীর অনুরণন থেকে উৎসারিত—যেখানে 'মনের মানুষ' হয়ে ওঠা শরীর বা সামাজিক পরিচয়ের নয়, বরং আত্মিক অনুভবের বিষয়।

এই নারীর চরিত্রে আমরা দেখতে পাই বিভূতিভূষণের 'অপরাজিত'–এর অপর্ণার নীরব নিষ্ঠা, তসলিমা নাসরিনের 'ক' উপন্যাসের আত্মস্বীকৃত প্রেমবোধের প্রতিবাদ, এবং রুমির সেই গূঢ় উপলব্ধি—

"The wound is the place where the light enters you. (Rumi, উদ্ধৃত Bruce, ২০১৮)"

এই নারী এক দার্শনিক প্রেমবোধের বাহক, যেখানে বিচ্ছেদ, বিপর্যয়, এবং প্রিয়জনের মানসিক বিকৃতি সত্ত্বেও প্রেম তার আলো হারায় না। অনন্তের মায়ের প্রেম আকুতি নয়, আরাধনা; তাঁর আকাঙ্ক্ষা নয়, আত্মদানের জাগরণ।

এইভাবে, অনন্তের মায়ের প্রেমগাথা হয়ে ওঠে এক পরিশুদ্ধ মানবিক দলিল—যেখানে ভাগ্য, বঞ্চনা ও ভালোবাসার নিরবচ্ছিন্ন আকুলতা মিলিত হয়ে সৃষ্টি করে নারীর আত্মপরিচয়ের এক দীপ্ত প্রতিমা।

- **বসন্ত-বিধ্বস্ত প্রেম ও অস্তিত্ববিধুর মানব-নাট্য:**

অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে বসন্তোৎসবের দিন এক নারীপ্রেমের নিষ্ঠুর অবসানকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে এক গভীর ট্র্যাজেডি। যে নারী কিশোরকে ভালোবেসেছিলেন, তিনিই তাঁর প্রেয়সীর হাতে চরম অপমানের শিকার হন। মানসিক বিপর্যয় ও আবেগপ্রবণ অস্থিরতার মাঝে, কিশোর অনন্তের মায়ের ওপর নির্দয়ভাবে চড়াও হয়; ফলত, গ্রামবাসীর শাস্তির মুখে

পড়ে আত্মহত্যা করে। এই মৃত্যুর অভিঘাতে অনন্তের মা—যিনি কখনো তাঁর উন্মাদ স্বামীকে সুস্থ করার জন্য প্রাণপাত করেছিলেন—অসহ্য আত্মগ্লানিতে মাত্র দুই দিনের ব্যবধানে মৃত্যুবরণ করেন।

এই করুণ ট্র্যাজেডির মূল অন্তঃসুর হচ্ছে এক অলিখিত, অস্বীকৃত, নামহীন ভালোবাসার ব্যর্থতা ও অস্তিত্বহীনতার কাতর আর্তি। অনন্তের মা নামহীন—যা কেবল ভাষিক নিরবতাই নয়, বরং "এক সত্তার অস্তিত্ব-লুপ্তি, এক আত্মিক নির্বাসন"-এর প্রতীক। ড. রুমেলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়:

> "যার কোন মর্যাদা নেই, যার প্রেম প্রতিষ্ঠা পায় না, যে সন্তানের পরিচয় দিতে পারে না, যে স্বামীকে উন্মার্গগামিতা থেকে স্বাভাবিকতায় আনতে চেয়েও পারে না সমাজের প্রতিকূলতায়, কী প্রয়োজন তার নামে? (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৭, পৃ. ১৭৪–১৭৫) 'নাম' তো নামবাচক শুষ্ক একটা শব্দ নয়··· কী আছে অনন্তর মায়ের?"(মল্লবর্মণ, ২০১৪)

এই বক্তব্য যেমন অনন্তর মায়ের অন্তর্জীবনের বেদনাকে চিত্রিত করে, তেমনি সমাজের হৃদয়হীন কাঠামোকেও নির্মমভাবে উন্মোচিত করে। তিনি বিদ্রোহ করতে পারেন না, আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে পারেন না—বরং নিঃশব্দে বিলীন হন। তাঁর বিপরীতে শরৎচন্দ্রের রাজলক্ষ্মী বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃণাল চরিত্র আত্মপ্রতিবাদ বা আত্মহননের মধ্য দিয়ে অস্তিত্বের নির্দিষ্ট ভাষা খুঁজে পান। কিন্তু অনন্তর মা কেবলই এক 'নামহীন' অতৃপ্ত আত্মা।

এই মৃত্যু ও অপূর্ণতার কাহিনি কেবল ব্যক্তি-চরিত্রে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তা ছড়িয়ে পড়ে তিতাসের প্রকৃতি, ঋতু ও দৃশ্যপটে। বসন্ত এখানে ফুল ও রঙের উৎসব নয়—এ এক ঋতুচক্রের বিষণ্ন ব্যঙ্গ, যেখানে বেদনা ঢেকে থাকে উল্লাসের আবরণে। বসন্ত আর প্রেম এখানে সমার্থক নয়; বরং শব ও শূন্যতার প্রতীক।

এইভাবে, এই অধ্যায় উপন্যাসের গভীরে প্রবেশ করে—প্রেম, শোক, নামহীনতা ও আত্মবিসর্জনের এক অপার অস্তিত্বদ্রষ্টা ব্যাখ্যা হয়ে ওঠে, যেখানে ব্যক্তিগত ব্যর্থতাই বৃহত্তর সামাজিক ও দার্শনিক ট্র্যাজেডির রূপ ধারণ করে।

- **স্বপ্নভঙ্গ ও পিতৃ-মাতৃ বেদনার অনন্ত অনুরণন:**

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে কিশোরের মানসিক বিপর্যয় কেবল ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি নয়, তা তার পিতা-মাতার নিঃশব্দ স্বপ্নভঙ্গ এবং গৃহস্থ জীবনের সম্ভাব্য আনন্দ-পরিকল্পনার চূড়ান্ত ভাঙন। লেখক জীবনের এই শূন্যতাকে যে বেদনাঘন শিল্পে রূপ দিয়েছেন, তা চিরন্তন পারিবারিক কাঠামোর গভীরতর মানবিক সংকটকে সামনে আনে।

"সন্তানের সুখেই পিতা-মাতার সুখ"—এই প্রাচীন জীবনদর্শন ঈশ্বরী পাটনীর পংক্তিতে ধ্বনিত:

"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে। (পাটনী, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য)"

এই অভিলাষ কেবলমাত্র এক সংস্কার নয়, বরং পিতামাতার আত্মপরিচয়ের একটি নির্ভরযোগ্য ভিত্তি।

তবে সেই আশার আলো নিভে যায় কিশোরের ফিরে আসায়, এক মানসিক ভারসাম্যহীন রূপে। এই আকস্মিক ঘূর্ণিতে ভেঙে পড়ে তাঁদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, সংসারের কাঙ্ক্ষিত শান্তিপূর্ণ পরিণতি রূপ নেয় এক ট্র্যাজিক নিস্পন্দতায়। কিশোরের বিবাহ না হয়ে সুবলার সঙ্গে বাসন্তীর বিবাহ যে রাতে হয়, সেই রাতে—

"...বুড়া বুড়ির চোখে সে রাতে আর ঘুম আসিল না।" (মল্লবর্মণ, ২০১৪)

এই একটি বাক্যই এক অনন্ত বেদনার অনুরণন। সেই রাতে 'হুকার শব্দে বাজনার শব্দ ঢাকিবার' প্রচেষ্টা এবং 'টিমটিমে আলো'—সব মিলিয়ে এক নিঃসঙ্গতার প্রতীকী প্রতিচিত্র। সন্তান জীবিত, অথচ মানসিকভাবে মৃতপ্রায়—এ যেন এক 'অপমৃত্যু', জীবনের অপূর্ণতার সবচেয়ে করুণ রূপ।

রবীন্দ্রনাথ যেন এই বেদনাকে পূর্বেই ভাষায় ধরেছিলেন:

"মৃত্যু যেখানে একদিন আশীর্বাদ হয়ে আসে, সেই মৃত্যু-প্রসন্নতার পূর্বে দীর্ঘ নিঃসঙ্গ যন্ত্রণা আরও অসহনীয়। (ঠাকুর, পৃ. অজ্ঞাত)" আর বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, সন্তানহীন পিতার হৃদয় যেন "অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া নক্ষত্রের মত।" (মল্লবর্মণ, ২০১৪)

এইসব তুলনা কিশোরের পিতা-মাতার অভ্যন্তরীণ ক্ষরণকে শুধু সাহিত্যিক নয়, এক অস্তিত্ববাদী অভিজ্ঞতায় রূপান্তর করে। বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক'-এ রায়বাহাদুরের চরিত্রেও সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনুরূপ বিষাদের রূপ আমরা দেখি। তেমনি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা'-য় নিয়তির নিষ্ঠুরতার প্রভাব ব্যক্তি-চরিত্রে প্রতিভাত হয়েছে।

অদ্বৈতের এই উপস্থাপন তাই শুধুমাত্র একটি পুত্রের দুর্ভাগ্য নয়, বরং পিতামাতার স্বপ্ন, পরিচয় এবং সাংসারিক অস্তিত্বের নিরুত্তর ভাঙনের কাহিনি। এখানে 'আশা' এক 'ছদ্মবেশী প্রতারণা', যা ধীরে ধীরে মানবিক সম্পর্কের অন্তঃস্থ বিষাদে রূপান্তরিত হয়।

এইভাবে লেখক আমাদের মনে করিয়ে দেন—স্বপ্নভঙ্গ, নিঃসঙ্গতা ও নিগূঢ় যন্ত্রণা কেবল একজনের অভ্যন্তরে নয়, তা একটি গোটা পরিবার, একটি সংস্কৃতি, এবং এক বহমান মানবজীবনের অংশ। তার মধ্যেই নিহিত থাকে এক অন্তহীন সৌন্দর্যচেতনা ও দার্শনিক অভিজ্ঞান—যা বাংলা উপন্যাসকে পৌঁছে দেয় চরম শিল্পসাধনার উচ্চতায়।

- **বাসন্তীর ব্যর্থ প্রেম-প্রতিজ্ঞা ও ভাগ্যচক্রে বন্দি জীবন:**

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে বাসন্তীর জীবনচিত্র এক করুণ ট্র্যাজেডি, যেখানে নারীজীবনের প্রেম, প্রত্যাশা ও পুনরাবৃত্তি হয়ে ওঠে সমাজ ও নিয়তির নির্মম ক্রীড়ার প্রতীক। কৈশোরে কিশোর ও সুবলের সঙ্গে তার আত্মিক সম্পর্ক এক অলৌকিক উজ্জ্বলতায় রঙিন হলেও, প্রেমে তার পক্ষপাত বরাবরই কিশোরের প্রতি। কিশোরের সঙ্গে তার বিবাহ ঠিক হলেও, তিতাসে গিয়ে কিশোর অন্য নারীতে আসক্ত হয় এবং উন্মাদ হয়ে ফিরে আসে। বাসন্তীর জীবনে প্রথম প্রেম ভেঙে পড়ে, আর সে সমাজচ্যুত ও পরিত্যক্ত অবস্থায় এক বিধ্বস্ত আত্মপরিচয়ে আবদ্ধ হয়।

এরপর কিশোর নিজেই সুবলকে বলে বসে,

"সকল কথা শুনিয়া সুবল আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া বলে, 'দাদা। তা হইলে বাসন্তীরে তুমি এখানেই পাইয়া গেলা। অখন দেশের বাসন্তীরে কার হাতে তুইল্যা দিবা কও।'

'তোর হাতে দিয়া দিলাম।'

সুবলের মনে একটা আশার রেশ গুন গুন করিয়া উঠে।" (মল্লবর্মণ, ২০১৪)

এই সংলাপ হৃদয়স্পর্শী প্রেমের প্রতিশ্রুতিকে প্রকাশ করলেও, বাস্তবতা ভিন্ন। বাসন্তী-সুবলের দাম্পত্যও অল্প সময়ের মধ্যেই নদীতে দুর্ঘটনায় সুবলের মৃত্যুর মাধ্যমে চূড়ান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বাসন্তীর কপাল থেকে ফের মুছে যায় শাঁখা-সিঁদুর, আবারও সে বিধবার শোচনীয় পরিচয়ে বন্দি হয়।

বাসন্তীর জীবন যেন নারী-ভাগ্য ও সামাজিক কাঠামোর এক অনিবার্য শোকসঙ্গীত। সমাজের পুরুষতান্ত্রিক নিয়মাবলির নির্মম রূপ, সামাজিক কর্তৃত্ব ও নিয়তির রূঢ় পরিহাসে তার প্রেম ও আত্মপরিচয় বারবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এই ট্র্যাজেডি রবীন্দ্রনাথের চারুলতা কিংবা শরৎচন্দ্রের কিরণময়ীর স্মরণ করিয়ে দেয়, তবে বাসন্তীর নিঃশব্দ যন্ত্রণা আরও গভীর, আরও ব্যক্তিগত। প্রতিটি সম্পর্কভঙ্গ এক একটি আত্মিক মৃত্যুর নিকটতর প্রতিচ্ছবি।

এই ব্যর্থতা কেবল বাসন্তীর একক পরিণতি নয়—বরং এটি একটি বৃহত্তর সাংস্কৃতিক সংকটের উপস্থাপনা। তিতাসের স্রোতের মতো মালো সমাজের জীবনপ্রবাহে নারীর অবস্থান স্থায়ী নয়; বরং প্রেম, প্রথা ও পরিত্যাগ দ্বারা পরিচালিত। এই জীবনগাথা শেষপর্যন্ত এক নীরব প্রশ্ন তোলে—এই সমাজে একজন নারীর স্বপ্ন কি কখনও সত্যি হতে পারে?

- **বিধাতার কাব্যিক নির্মমতায় বাসন্তীর অতৃপ্ত সংসার-স্বপ্ন:**

অদ্বৈত মল্লবর্মণের *তিতাস একটি নদীর নাম*-এ বাসন্তীর জীবনের পরিণতি এক অলিখিত কাব্যিক ট্র্যাজেডি, যেখানে প্রেম ও সংসারের স্বপ্ন নিয়তির নির্মমতায় বারবার ছিন্নভিন্ন হয়েছে। সুবলের সঙ্গে তার সংসারযাত্রা শুরু হয় প্রত্যাশার আলোয়, কিন্তু তা শেষ হয় জীবনবিনাশী নদীর করাল গ্রাসে। সেই শোকাবহ মুহূর্ত যেন জীবনের অনিবার্য নিয়তির প্রতীক—যা বাসন্তীর জীবনে রেখে যায় অপূরণীয় শূন্যতা।

সুবলের মৃত্যু তার জীবনের "উপসংহারে এক অনিবার্য ট্র্যাজেডি" হয়ে ওঠে, ঠিক যেমন বিভূতিভূষণের অপু দুর্গার মৃত্যুতে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। বাসন্তীর ব্যক্তিত্বের গভীরে নিহিত রয়েছে এক স্তব্ধ অথচ সচেতন প্রেমানুভব—প্রথমে কিশোর, যিনি তাকে প্রত্যাখ্যান করেন; পরে সুবল, যিনি সঙ্গ দেন, কিন্তু সুখ দিতে পারেন না। এই ব্যর্থতা সামাজিক অভিধায় উচ্চারিত হয়—"সুবলের বউ"—এই নামেই। অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস যথার্থই লক্ষ করেন:

"প্রেমের যে বারিধারায় বাসন্তী স্নাত হতে চেয়েছিল, কিশোরের অন্যত্র বিবাহ ও উন্মাদনায় সেই ধারা স্নান থেকে বাসন্তী বঞ্চিত হয়..." (মল্লবর্মণ, ২০১৪)

বাসন্তীর হৃদয়কথা তার মন্তব্যে মূর্ত হয়:

"পুরুষ মানুষ দিয়া কি হইব। তারা বৃষ্টির পানি-ফোঁটা, ঝরলেই শেষ। তারা জোয়ারের জল। তিলেক মাত্র সুখ দিয়া নদীর বুক শুইষ্যা নেয়।" (মল্লবর্মণ, ২০১৪)

এই উক্তির প্রতীকচিত্রে পুরুষতন্ত্রের স্বল্পস্থায়ী ভালোবাসার প্রতারণা ও নারীর চিরন্তন প্রত্যাশাভঙ্গ প্রতিফলিত। এটি যেন শুধু বাসন্তীর নয়, কুসুম কিংবা রাজলক্ষ্মীর মতো অনেক নারী চরিত্রেরও কণ্ঠস্বর। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্ত্রী' কবিতার পঙ্‌ক্তি স্মরণীয়—

"সে যে কেবলই বাহির হতে চায়—
সে জানে না ভিতরের আর্তি কাকে বলে।" (মল্লবর্মণ, ২০১৪)

বাসন্তীর জীবন যেন সেই অন্তর্নিহিত আর্তির প্রতিফলন, যেখানে সামাজিক নাম-মাত্র পরিচয়ের আড়ালে চাপা পড়ে গেছে তার আত্মিক আকাঙ্ক্ষা। অতৃপ্ত প্রেম, সংসারভঙ্গ, ও নিয়তির ছলনা—সব মিলিয়ে সে রূপান্তরিত হয়েছে এক সর্বজনীন নারীব্যথার শিল্পরূপে। তার অস্তিত্ব কেবল একজন চরিত্র নয়, বরং এক অনন্য সাহিত্যিক প্রতিমা।

- **প্রত্যাশার প্রত্যাবর্তন ও মাতৃত্বের মৌন প্রতিক্রিয়া:**

অদ্বৈত মল্লবর্মণের *তিতাস একটি নদীর নাম*-এ বাসন্তী কেবল একজন প্রান্তিক নারী নন—তিনি এক জটিল আত্মপরিচয়ের সংকটে জর্জরিত চিরন্তন প্রত্যাশার প্রতিমা। তাঁর কিশোরের প্রতি আকর্ষণ ছিল আত্মার পরিচয়ের আকুলতা, 'কিশোরের বউ' হয়ে ওঠার মধ্যেই সে খুঁজে পেয়েছিল নিজেকে। কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তির খেয়ালে সে হয়ে ওঠে 'সুবলের বউ'—এক শুষ্ক, আত্মবিরোধী পরিচয়ে বন্দি, যেখানে সম্পর্কের বাস্তবতা ছিল অনুপস্থিত, আর মাতৃত্ব—এক ব্যর্থ প্রতীক্ষা।

এই নিঃসন্তান জীবনে বাসন্তীর মাতৃত্ববোধ নিঃশব্দে অনাহূত থেকেছে। তবু কিশোর-পুত্র অনন্ত যেন তার জন্য পরোক্ষভাবে হয়ে ওঠে সন্তানস্বরূপ। 'মাসী' পরিচয়ে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তা নিছক আত্মীয়তা নয়, বরং এক গোপন মাতৃসত্তার প্রকাশ—প্রত্যাশার অনুচ্চারিত প্রতিস্থাপন। এই স্নেহ কখনো আত্মত্যাগে, কখনো কঠোরতার মুখোশে প্রকাশ পায়, যেমন অনন্তকে গালমন্দ করে দূরে সরিয়ে দেওয়া—যা এক নিঃশব্দ মাতৃবেদনার বহিঃপ্রকাশ।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'মাতৃভক্তি' কবিতাটি স্মরণীয়:

"মা বলে ডেকেছিল শিশুটি, মায়ের পানে চেয়েছিল মুখ।
মা তখন অশ্রু লুকোচ্ছিল; শিশুটি বুঝল না দুঃখ।" (মল্লবর্মণ, ২০১৪)

অনন্তও হয়তো বুঝতে পারেনি সেই মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা বাসন্তীর রক্তক্ষরণ। অথচ পাঠক তা অনুভব করে। এই না-পাওয়ার দীর্ঘ বেদনা ক্ষণিকের জন্য তিতাসের নৌকাবাইচে পৌঁছায় এক আবেগঘন পরিণতিতে, যখন বাসন্তী অনন্তকে দেখে চিৎকার করে ওঠে:

"মাসী ডাকে আকৃষ্ট হইয়া বলার বউ চকিতে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, তারপর সে উদ্দাম হইয়া বলিয়া
উঠিল, অনন্ত? আমার অনন্ত!
… মাসীর দুই চোখে অশ্রুর বন্যা বহিয়াছে (মল্লবর্মণ, ২০১৪)।"

এই মিলন-দৃশ্য শুধু আবেগ নয়, এক অশ্রুসিক্ত আত্মপূর্ণতা—বাসন্তী হয়ে ওঠেন এক অলিখিত জননীস্বরূপ, যে সমাজনির্ধারিত বন্ধন অতিক্রম করে মাতৃত্বের চরম রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এই চরিত্রচিত্রণে শরৎচন্দ্রের রাজলক্ষ্মী কিংবা বিভূতিভূষণের রতনের মত চরিত্রের প্রতিফলনও চোখে পড়ে, যারা সামাজিক সম্পর্কের সীমা ছাড়িয়ে বৃহত্তর মানবিক বন্ধনে পৌঁছেছে।

অতএব, বাসন্তী নিছক এক পরিত্যক্তা নারী নন; তিনি মাতৃত্ব, আত্মত্যাগ, স্মৃতি ও প্রেমের সম্মিলিত প্রতিমা—এক অভিমানিনী মা, যিনি "ভালোবাসার ভাষা মুখে বলেন না, চোখের জলে গাঁথেন এক চিরন্তন গান। (মল্লবর্মণ, ২০১৪)"

- **অন্তর্জালা ও আত্মপরিত্যাগ : মাতৃত্বের দ্বন্দ্বেএক নারীর নীরব কান্না:**

সন্তানহীন জীবনের দীর্ঘশ্বাস আর অন্তর্জ্বালায় দীর্ণ সুবলের স্ত্রী, বহুদিন পর অনন্তকে ফিরে পেয়ে এক মায়ের গর্বিত আবেগে আলোড়িত হলেও, সেই পুনর্মিলনের পর্দার অন্তরালে লুকিয়ে থাকে তার নিজেরই গ্রহণযোগ্য আত্মত্যাগ। পরিস্থিতির দহন তাকে বাধ্য

করেছিল নিজ সন্তানকে নিজেই পরিত্যাগ করতে, যার প্রতিক্রিয়ায় সে নিজেকে ভেতরে ভেতরে ক্ষয় করেছিল। অনন্তকে কাছে পাওয়ার মুহূর্তে সেই গোপন মাতৃত্বজ্বালার নিঃশব্দ ভাষা মুখর হয়ে ওঠে—কিন্তু ঠিক তখনই সেই মাতৃত্বই দাঁড়ায় চরম পরীক্ষায়।

উদয়তার কুটিল প্ররোচনায় অনন্ত আর সেই নারীর দিকে ছায়া ফেলে সন্দেহের দৃষ্টি। শৈশবের মমতার পরিধি হঠাৎ করেই মুছে গিয়ে তার হৃদয় কঠোর ও নির্দয় হয়ে ওঠে। সেই প্রত্যাখ্যান যেন সুবলের বউয়ের বুক চিরে নেমে আসে এক মহা-শূন্যতা। মাতৃত্বের অপ্রকাশিত আকুতি তখন এক প্রশ্নে স্ফুরিত হয়:

" তুইও কি আমার পর হইয়া গেলি অনন্ত?" (মল্লবর্মণ, ২০১৪)

এই এক প্রশ্নেই লুকিয়ে আছে অধিকারচ্যুতি ও মর্মবেদনার ইতিহাস। কিন্তু অনন্তের উত্তর তা যেন আরও শীতল করে তোলে:

"আপন তো কোন কালে নই মাসী... মা মরিয়া গেল, সে আদরো একদিন হাট-বাজারের মতই ভাঙ্গিয়া পড়িল।" (মল্লবর্মণ, ২০১৪)

এই সংলাপে ভালবাসা হয়ে ওঠে পণ্য, সম্পর্ক হয়ে ওঠে চুক্তির মতো ভঙ্গুর। "ভাঙ্গিয়া পড়িল" শব্দযুগল এক অলৌকিক ধ্বনি—যেখানে আত্মিক সংযোগের ছিন্নতা এক বিষণ্ন রূপক হয়ে ধরা দেয়।

সুবলের বউয়ের আকুল প্রশ্ন,

" ভাঙ্গিয়া পড়িল! কি করিয়া তুই বুঝিলি যে, ভাঙ্গিয়া পড়িল?" (মল্লবর্মণ, ২০১৪)

এই উচ্চারণ আর প্রশ্ন নয়, এক নৈঃশব্দ্যের আর্তনাদ—ভালবাসার বিশুদ্ধতায় সে কোনো ভাঙন অনুভব করেনি, কারণ তার ভালবাসা তো কোনো শর্তে বাঁধা ছিল না।

এই অংশে মল্লবর্মণ মাতৃত্বকে দেখিয়েছেন এক নিঃস্বার্থ আত্মনিবেদন হিসেবে—যেখানে ত্যাগ চূড়ান্ত, কিন্তু স্বীকৃতি নেই; ভালোবাসা পরিপূর্ণ, কিন্তু প্রতিদান অসম্ভব। এটি কেবল সম্পর্কের ট্র্যাজেডি নয়, বরং নারী-অস্তিত্বের নিঃসীম আত্মবিলয়ের প্রতীক।

- **সারল্য বনাম স্বার্থবোধ:**

এই পরিস্থিতিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দেনাপাওনা' নাটকের বিমলা চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বিমলাও স্বামীহীন জীবনের যন্ত্রণায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু তার মধ্যে যে প্রেম ও ত্যাগ, তা তাকে পুনরায় সম্মানের স্থানে নিয়ে আসে। সুবলের বউয়ের ক্ষেত্রে সেই পরিত্রাণ আসে না—বরং সে এক নির্বাক যন্ত্রণার মূর্ত প্রতীক হয়ে থেকে যায়।

আবার 'পথের পাঁচালী'তে ইন্দির ঠাকরুন যেমন মমত্ববোধে পূর্ণ হয়েও দিনের শেষে একটি 'অপ্রয়োজনীয় বোঝা'তে রূপান্তরিত হন, তেমনি সুবলের বউ-ও হয়ে ওঠে এক প্রত্যাখ্যাত মমতার প্রতিচ্ছবি।

- **মাতৃত্ব ও প্রাতিষ্ঠানিক ন্যায্যতা:**

সমাজে 'মা' পরিচয়টিকে অলৌকিক গুণে অলঙ্কৃত করা হলেও, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তার অস্তিত্বের স্বীকৃতি অনেক সময়েই অনুপস্থিত থাকে। সুবলের বউয়ের ক্ষেত্রে এ মাতৃত্ব কেবল স্নেহ নয়, ছিল আত্মনিবেদন; অথচ সমাজ বা অনন্ত, কেউই তা চিনতে পারে না। এই ব্যর্থতা আমাদের সেই সংবেদনশীলতাকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায় যা মাতৃত্বের নৈতিকতা আর ভালোবাসার মূল্যবোধকে ভূলুণ্ঠিত করে।

- **এক ছিন্নমাতৃত্বের একাকী প্রান্তর:**

সুবলের বউয়ের এই যন্ত্রণাময় মুহূর্ত যেন এক ক্লান্ত হৃদয়ের অন্তিম দীর্ঘশ্বাস। অনন্তের প্রত্যাখ্যানে সে কেবল তার ছেলেকে হারায়নি, হারিয়েছে নিজের অস্তিত্বের প্রামাণ্য দলিল। তার মাতৃত্বের যে স্মৃতি ছিল, তা আজ ইতিহাসের পাতায় রক্তাক্ত লিখন হয়ে ধরা দেয়। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই সম্পর্কের ভাঙন কেবল ব্যক্তি নয়, একটি শ্রেণির বেদনার দলিল হয়ে ওঠে।

- **মাতৃত্ববোধের ট্র্যাজেডি : আত্মপরিচয়ের সংকট ও নিষ্ঠুর বাস্তবতা:**

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে সুবলের বউয়ের চরিত্রটি মাতৃত্বের নিঃশব্দ কিন্তু তীব্র বেদনায় গঠিত এক করুণ প্রতিমা। অনন্তের জন্য তার অন্ধ স্নেহ ও পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন শুধুই সামাজিক মা-সন্তান সম্পর্ক নয়—তা এক হৃদয়ের অভিজ্ঞান। অথচ এই অগাধ মমতার প্রতিফলে অনন্ত যখন তাকে প্রত্যাখ্যান করে, তখন সে অনুভব করে এক প্রবল অস্বীকৃতির ঘা—একদিকে মাতৃত্ব হারানোর যন্ত্রণা, অন্যদিকে আত্মপরিচয়ের সংকট।

তাঁর অনুভব ক্ষোভে রূপ নেয়, অথচ সামাজিক স্বীকৃতি তো দূরস্থ, এমনকি প্রতিবাদ করতেও সুযোগ পায় না। সমাজ যখন তার প্রতিবাদকে আক্রমণ হিসেবে গণ্য করে, তখন সে হয়ে পড়ে নিঃস্ব ও নিঃস্বীকৃত—একাকী, নিঃসহায়, পরিত্যক্ত। এই বিপর্যয় কেবল মানসিক নয়, দেহতাত্ত্বিক স্তরেও প্রতিফলিত হয়। একসময় যাঁকে সমাজ সম্মান দিত, সে-ই আজ অপমানের শিকার:

"ছেলেবেলায় মা বাবা তাকে অত্যন্ত ভালবাসিত ... পাড়ার মধ্যে তার নিজের একটা মর্যাদা ছিল।" (মল্লবর্মণ, ২০১৪)

এই স্মৃতি ও বর্তমানের বৈপরীত্য এক ভয়াবহ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে—যেখানে আত্মপরিচয় ভেঙে পড়ে সমাজের নির্মম নির্মাণে। এই প্রসঙ্গে সুবলের বউয়ের মাতৃত্ব এক উত্তরাধিকারভিত্তিক সত্তা হয়ে ওঠে—নারী থেকে নারীকে প্রবাহিত:

"শরীরের ব্যথায় মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙ্গে... সংসারে কেবল মা-ই সত্য আর কিছু না।" (মল্লবর্মণ, ২০১৪)

এই বাক্যে ব্যক্তিগত নিঃসঙ্গতা এক সমষ্টিগত নারীবেদনায় রূপ নেয়। তাঁর মাতৃত্ব নিছক জৈবিক নয়, বরং এক অস্তিত্বগত অভিপ্রায়। এই দুঃখকে তুলনা করা যায় শৈলজানন্দের 'বেদিনীর আত্মকাহিনী'র বিনোদিনী, মহাশ্বেতা দেবীর 'স্তনদায়িনী' কিংবা শারদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তন্ময়ী' চরিত্রের সঙ্গে, যারা মাতৃত্ববোধ ও সমাজস্বীকৃতির সংকটের শিকার।

এই মাতৃত্ববোধের গভীরতা রাধারাণী দেবীর কথায় প্রতিফলিত:

"একটা নারী যখন মা হতে চায়, তখন সে ঈশ্বরের প্রার্থনা করে না; সে নিজেই ঈশ্বর হয়ে ওঠে। (দেবী, ২০১৪, পৃ. অজ্ঞাত)" (মল্লবর্মণ, ২০১৪)

এই উক্তি যেন সুবলের বউয়ের নিঃসন্তান মাতৃত্বকে এক মহিমান্বিত অথচ বেদনাবিদ্ধ রূপ দেয়—যেখানে মাতৃত্ব একান্ত মানবিক নয়, প্রায় অলৌকিক।

- **মাতৃত্ববোধের করুণ কাব্য: আত্মপরিচয়ের প্রান্তসীমায় এক নারীর আর্তি:**

অদ্বৈত মল্লবর্মণের *তিতাস একটি নদীর নাম*-এ সুবলের বউ চরিত্রটি মাতৃত্বের এমন এক নিঃস্বার্থ, অথচ অধিকারবঞ্চিত প্রতিমূর্তি, যিনি জৈবিক না হয়েও অনন্তকে সন্তানরূপে ধারণ করেছেন হৃদয়ে, আচরণে, বিসর্জনে। তার এই আত্মনিবেদিত ভালোবাসা সামাজিক স্বীকৃতি পায় না, ফলে মাতৃত্ববোধের অভিমান ও অপূর্ণতা এক করুণ অন্তঃসুরে ধ্বনিত হয়। লেখকের পর্যবেক্ষণ:

"তখন এই কথার মধ্যে একদিকে যেমন তার এই দুঃসময়ে নিজের মায়ের ওপর একান্ত নির্ভরতার দিকটি ধরা পড়ে, তেমনি তার মাতৃসত্তার অভিমানী কণ্ঠস্বরটিও এখানে স্পষ্ট।" (মল্লবর্মণ, ২০১৪)

এই অনুভব কেবল মাতৃত্বের জৈবিক ধারাকেই নয়, বরং আত্মিক মমত্ব ও সহমর্মিতাকে কেন্দ্রে এনে 'মা' শব্দটিকে এক বিশাল সত্তায় রূপান্তরিত করে। কিন্তু সামাজিক কাঠামো তার এই মাতৃত্বকে স্বীকৃতি দেয় না—ফলে জীবনব্যাপী ভালোবাসা, সেবা ও ত্যাগ সত্ত্বেও সে রয়ে যায় "মাসী", মা হয়ে উঠতে পারে না।

"সে শুধুই তার মাসী হয়েই থেকে গেছে—মা হয়ে উঠতে পারেনি। (বিশ্বাস, অভ্যন্তরীণ পাণ্ডুলিপি)"

এই অনুচ্চারিত দুঃখ যেন এক দীর্ঘশ্বাস হয়ে বাংলা কথাসাহিত্যের অমর করুণ সুরে মিশে যায়। স্মরণ করিয়ে দেয় শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের অভয়ার কথা, যেখানে মাতৃত্ব জন্মদানের পরিসর ছাড়িয়ে মমত্ববোধ, আত্মদান ও স্নেহসেবার মধ্যে পরিণত রূপ পায়।

উপন্যাসের সবচেয়ে বেদনাবিধুর মুহূর্ত আসে সুবলের বউয়ের মৃত্যুর প্রাক্কালে, যখন কল্পনায় ভেসে ওঠে অনন্তের বিবাহের দৃশ্য এবং মনে জাগে এক অভিমানি প্রশ্ন:

"সে দিনের মায়ের আসনটি কে গ্রহণ করবে?" (মল্লবর্মণ, ২০১৪, পৃ. ২৫৭)

এই প্রশ্ন শুধু তার বেদনার নিঃস্বর প্রকাশ নয়, বরং মাতৃত্ববোধ কত গভীরভাবে তার আত্মায় রোপিত ছিল, তারই নিরুচ্চার প্রমাণ। উদয়তারা কিংবা রমুর মায়ের মুখ মনে পড়া, নিজের দাবির দ্বিধা—সবই মিলে 'মা' শব্দটির অধিকার নিয়ে তার অন্তর্জগতে এক নিঃশব্দ অথচ প্রচণ্ড মানসিক সংঘাতের ইঙ্গিত দেয়।

এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে মল্লবর্মণ সৃষ্টি করেছেন এক আধুনিক নারীমনের প্রতিচ্ছবি, যেখানে মাতৃত্ব কেবল জৈবিক নয়, এক গভীর আত্মিক-সত্তার রূপ—সমাজের স্বীকৃতি না পেলেও, পাঠকের চেতনায় চিরকাল জ্বলজ্বল করে।

- **পরিণতি ও প্রতীক্ষার প্রতীক: অনন্তবালার বঞ্চনার কাহিনি:**

অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে অনন্তবালার জীবনে প্রেম, প্রত্যাশা ও প্রতীক্ষা যে করুণ পরিণতি নেয়, তা বাংলা সাহিত্যে চিরন্তন নারী-নিঃস্বতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। শৈশবে অনন্ত ও অনন্তবালার মধ্যে গড়ে ওঠা এক নিষ্কলুষ আত্মিক সম্পর্ক, তাদের নামের মিলেই যেন ঈশ্বরের গূঢ় ইঙ্গিত—'অনন্ত' ও 'অনন্তবালা'। পাঠকের মনে এক আশাব্যঞ্জক পরিণতির সম্ভাবনা জন্মালেও, অনন্তের শহরমুখো উচ্চাশা সেই সম্ভাবনাকে ছিন্ন করে দেয়।

চলার আগে অনন্ত বলে যায়—

"একদিন সে আবার তার কাছে ফিরবে, আর সেদিন অনন্তবালা যা বলবে, অনন্ত তাই শুনবে।" (মল্লবর্মণ, ২০১৪)

এই প্রতিশ্রুতিই হয়ে ওঠে অনন্তবালার জীবনের একমাত্র আলো। কিন্তু সময় গড়ায়, অনন্ত ফেরে না। তার নিরব প্রতীক্ষা মালোসমাজে রসিকতার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, সামাজিক কৌতুক ও অবজ্ঞা তাকে ঘিরে ধরে:

"দিনদিনই তাকে একটু একটু করিয়া বড় দেখায়। শেষে মা খুড়িমাদের চোখেও দৃষ্টিকটু হইয়া পড়িল। তার চাইতে ছোট মেয়েরা দেখিয়া মাঝে মাঝে ছড়া কাটে, 'অনন্তবালা ঘরের পালা, তারে নিয়ে বিষম জ্বালা।" (মল্লবর্মণ, ২০১৪)

এই ছড়ার মধ্যেই অনন্তবালার চরম নিঃসঙ্গতা, সামাজিক অপমান ও নারীর আত্মনিগ্রহের নিদারুণ রূপ ফুটে ওঠে। অনন্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী পুরুষের প্রতীক হয়ে ওঠে, আর অনন্তবালা বাংলার সেই চিরবঞ্চিত নারীচরিত্র, যার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা পায় না।

এই অসম্পূর্ণ প্রেমের ধারাটি বাংলা সাহিত্যে পূর্ববর্তী উদাহরণ, যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'—তুল্য এক ট্র্যাজিক দ্বন্দ্বের পুনরাবৃত্তি: প্রেমিকা আত্মাহুতি দেয়, প্রেমিক ফিরেও যথার্থ সাড়া দিতে পারে না।

- **প্রত্যাশা, প্রেম ও পরিচয়ের পতন: তিতাস-উপন্যাসে নারীবেদনার দার্শনিক অনুরণন:**

অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম'—প্রেম, মাতৃত্ব ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের এক ত্রিস্তরীয় ট্র্যাজেডি। উপন্যাসের দুই নারীচরিত্র—সুবলের বউ ও অনন্তবালা—দুজনেই নারীসত্তার ত্যাগ, প্রতীক্ষা ও নিঃশব্দ আকাঙ্ক্ষার প্রতিমূর্তি। একজনের মাতৃত্ব ব্যর্থ, অন্যজনের প্রেম অমোচনীয় এক প্রতারণায় ক্লিষ্ট; অথচ উভয়েই ছুঁয়ে যান এক অভিন্ন বেদনার রেখা।

অনন্তবালার প্রেম যেন জীবনের এক করুণ প্রতীক্ষার উপাখ্যান। পাত্রপক্ষ প্রত্যাখ্যান করে সে নিজেকে অবিচল রাখে অনন্তের স্মৃতিতে, অথচ "অনন্ত দাদা কি আমার জন্য কিছু পাঠিয়েছে?"—এই এক বাক্যেই তার গূঢ় নিবেদন প্রকাশ পায়। কিন্তু বাস্তবতা নির্মম; বনমালীর করুণ জবাবে সে বুঝে নেয় তার প্রতীক্ষা ছিল নিষ্ফল, অনন্তের স্মৃতিপট থেকে মুছে গেছে তার অস্তিত্ব। তার জীবনের দ্বন্দ্ব তাই চিরন্তন মানবিক সঙ্কটের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়—প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির অনতিক্রম্য ব্যবধান।

এই বেদনার আরেক স্তর আবির্ভূত হয় মালো সমাজের সাংস্কৃতিক ভাঙনে। 'তিতাস' কেবল নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস নয়, বরং এক বিলুপ্তপ্রায় জনজাতির আত্মপরিচয় সংকটের দলিল। লোকগান, ভাটিয়ালি, কীর্তনের মতো সাংস্কৃতিক রূপরেখা যখন যাত্রাপালার উচ্ছৃঙ্খলতার সঙ্গে মুখোমুখি হয়, তখনই শুরু হয় মালোদের সাংস্কৃতিক চ্যুতি। এই দ্বন্দ্বে বাসন্তী ও মোহন হয়ে ওঠে ঐতিহ্যের শেষ রক্ষাকর্তা, যারা "মোহনের ঘরে বসে স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে চয়ন করে তারা লোকগানের সুধানিধি পরিবেশন (মল্লবর্মণ, ২০১৪, পৃ. ২১৫)" করে সমাজকে পুনর্জাগরণের আহ্বান জানায়।

কিন্তু এই সাধনাও শেষ পর্যন্ত হয় এক নিঃসঙ্গ ও মহৎ অথচ পরাজিত প্রয়াস। যাত্রাগানের মিথ্যা মোহ সমাজকে পুনরায় গ্রাস করে নেয়, আর তখনই ঔপন্যাসিকের নিঃশব্দ অথচ হৃদয়বিদারক উচ্চারণ:

> "মাত্র দুইটি নরনারী গেল না। তারা সুবলার বউ আর মোহন। অপমানে সুবলার বউ বিছানায় পড়িয়া রহিল, আর বড় দুঃখে মোহলের দুই চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল।" (মল্লবর্মণ, ২০১৪)

এই সংলাপ যেন নারীজীবন, প্রেম, সংস্কৃতি ও পরিচয়ের পরাজয়ের এক গূঢ় চিহ্ন। 'তিতাস একটি নদীর নাম'–এ প্রেম ও মাতৃত্ব, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পরিচয় রক্ষার আকুল আকাঙ্ক্ষা—all collapse under the weight of a silent but inevitable tragedy. এই উপন্যাস তাই এক করুণ দ্রষ্টার দৃষ্টিতে গৃহীত মানবিক সংকটের চিত্রমালা, যেখানে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের অন্তর্লিখিত বেদনাই হয়ে ওঠে সাহিত্যিক পরম্পরার অনন্য সংযোজন।

- **লোকসংস্কৃতির অবক্ষয় ও অস্তিত্বসংকটের প্রতীকরূপে তিতাস: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির পরিণতি:**

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে বাসন্তী ও মোহনের সংগ্রাম শুধু একটি সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির রক্ষাকল্প নয়, বরং একটি বৃহৎ সাংস্কৃতিক সংকটের রূপক। এটি সেই আত্মপরিচয়ের ক্রমহ্রাসমান ইতিহাস, যেখানে গ্রামীণ লোকসংস্কৃতি আধুনিকতার আগ্রাসনে বিপন্ন হয়ে ওঠে। বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা', কিংবা দেবেশ রায়ের 'তিস্তা পাড়ের বৃত্তান্ত'-এর মতোই, এখানে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীসমষ্টি একসাথে হারিয়ে ফেলে নিজস্বতা, আর প্রতিক্রিয়াজনিত এই সংঘর্ষ পরিণত হয় আত্মসংঘাতে।

তিতাস কেবল একটি নদীর নাম নয়—এটি এক বিস্মৃতপ্রায় সংস্কৃতির করুণ দলিল। উপন্যাসের শেষভাগে যখন নদী শুকিয়ে গিয়ে অন্তর্জলে চর জেগে ওঠে, তখন তা হয়ে ওঠে একটি জীবন্ত সাংকেতিক দৃশ্য—যেখানে ভাঙনের মুখে পড়ে মালো জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব, জীবিকা ও সম্মানবোধ। নদী শুধু তাদের জীবনের আধার নয়, এক মাতৃসম আশ্রয়—ঔপন্যাসিকের ভাষায়, "তিতাস মায়ের মতোই তাদের রক্ষা করবে। (মল্লবর্মণ, ২০১৪, পৃ. ২২১)" এই নদী নারীর কাছে যেমন নির্ভরতার প্রতীক, তেমনি পুরুষদের কাছে তা জীবনের স্বপ্ন ও আত্মমর্যাদার উৎস।

এই বিশ্বাস যখন বাস্তবতার মুখে ভেঙে পড়ে, তখন মালো সমাজের সম্মিলিত আত্মপরিচয় সংকটগ্রস্ত হয়ে ওঠে। বিজয় নদীর সঙ্গে তিতাসের তুলনায় মালোদের আত্মবিশ্বাস ও অহংকার যেমন স্পষ্ট, তেমনি বিজয়-তীরের জেলেদের প্রতি তাঁদের সহানুভূতিরও পরিচয় মেলে:

> "সে সব গাঁয়ে তারা দেখিয়াছে, চৈত্রের খরায় নদী কত নিষ্করুণ হয়। একদিক দিয়া জল শুখায় আর একদিক দিয়া মাছেরা দমবন্ধ হবার আশঙ্কায় নাক জাগাইয়া হাঁপায়। মাছেদের মত জেলেদেরও তখন দমবন্ধ হইতে থাকে।" (মল্লবর্মণ, ২০১৪)
>
> " বিজনার পারের মালোগুষ্ঠি বড় অভাগা রে ভাই, বড় অভাগা।" (মল্লবর্মণ, ২০১৪)

তবে যে তিতাসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল বাস্তুতন্ত্র, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়ের নীড়—উপন্যাসের শেষাংশে সেই আশ্রয়-স্বরূপই বিলীন হয়ে যায়। নদীর জলশূন্যতা রূপ নেয় অস্তিত্বের সংকটে। অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস যথার্থই বলেছেন:

> "আবাস, আস্থা, মাতৃত্ব, শান্তি ও স্বপ্নের যে নীড় তিতাসের প্রারম্ভিক খণ্ডে গড়ে তোলা হয়, সেই নীড়ই তো উপন্যাসের অন্তিমে পৌঁছে খান খান হয়ে ভেঙে যায়। তখন জলের বদলে জেগে থাকে তৃষ্ণা, স্বপ্নের বদলে জাগে অন্ধকার।" (মল্লবর্মণ, ২০১৪)

এইভাবে, 'তিতাস একটি নদীর নাম' একাধারে প্রতীক, প্রতিরূপ এবং প্রতিধ্বনি—যেখানে লোকসংস্কৃতির মৃদু কণ্ঠ আধুনিকতার শূন্যতায় হারিয়ে যায়, আর প্রত্যাশার স্থানে মাথা তোলে প্রাপ্তির নিষ্ফলা গহ্বর।

- **নদী ও জীবন: 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ অস্তিত্বের প্রতীকায়ন:**

বাংলা সাহিত্যে নদী কেবল ভূগোল নয়—তা এক জীবনদর্শনের প্রতীক। যেমন 'পদ্মানদীর মাঝি'-তে পদ্মা কুবেরদের ভাগ্য-নির্ধারক চরিত্রে আবির্ভূত, তেমনি অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ তিতাস হয়ে ওঠে মালোদের 'প্রাণতরঙ্গ', স্বপ্ন ও সংস্কৃতির ধারক। নদী এখানে জীবনের প্রবাহ, আবার তার বিপর্যয়ের প্রতীকও।

তিতাসে চর জাগা কেবল প্রকৃতির পরিবর্তন নয়; বরং মালো জাতির এক অস্তিত্বগত সংকেত—তাদের প্রথাগত জীবনব্যবস্থা ও গোষ্ঠীগত স্বপ্নভঙ্গের করুণ প্রতীক। সময় হয় নির্বিকার, মানুষ অসহায়—এভাবে ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি হয়ে ওঠে এক সামষ্টিক মহাকাব্য।

"মানুষ চায় এক, আর হয় আর এক" (মল্লবর্মণ, ২০১৪)—এই নিয়তির রূঢ় সত্য যেমন 'পুতুলনাচের ইতিকথা'-তে মানুষকে নিয়তির পুতুলে রূপ দেয়, তেমনি 'তিতাস...'-এও তা বহে এসেছে নদীর প্রতীকে। মালোদের জীবনধারা—নৌকাজীবন, লোকসংস্কৃতি, জীবিকা—সব কিছুই নদীর সঙ্গে যুক্ত; নদীর শুষ্কতা তাই এক সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও অস্তিত্বগত অবক্ষয়ের প্রতীক।

উপন্যাসের বিন্যাসেও এই বেদনাময় ভাঙনের প্রতিফলন—চারটি খণ্ডে বিভক্ত আটটি অধ্যায় যেন জীবন নামক আয়নার ভাঙা প্রতিচ্ছবি: পরস্পর বিচ্ছিন্ন, তবু অন্তঃস্থলে যুক্ত এক ট্র্যাজিক সুরে। প্রতিটি চরিত্র নিয়তির করুণ শিকার, যাদের জীবনে নেই কোনো পূর্ণতা, শুধু অতৃপ্তি, শূন্যতা ও হাহাকার।

"তিতাসের বুকে যেমন একদিন ছিল উচ্ছল জলরাশি, আজ তেমনি তার বুকে কেবল তৃষ্ণার ছায়া" (মল্লবর্মণ, ২০১৪)—এই লাইন যেন নদী ও জীবনের দুর্দশার এক অভিন্ন প্রতিচ্ছবি। মালোদের ইতিহাস এখানে নদীর বুকে লেখা, যা জল শুকালে শুধু ধূলি ও বেদনার সাক্ষ্য রেখে যায়।

অদ্বৈতের এই কাব্যিকতা রবীন্দ্রনাথের ‘শেষের কবিতা’-র আত্মসমীক্ষাত্মক দার্শনিক প্রেম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে প্রেম নেই মুক্তির পথিক, বরং সম্পর্ক, স্বপ্ন, আত্মপরিচয়—সবই নদীর জলের মতো ক্রমাগত ঝরে পড়ে।

এইভাবেই ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ হয়ে ওঠে এক নিঃশব্দ বিলুপ্তির মহাকাব্য—এক জাতির হারিয়ে যাওয়া সত্তার অলিখিত ইতিহাস, যেখানে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির দ্বন্দ্ব চিরস্থায়ী ছায়ার মতো বয়ে চলে।

উপসংহার (Conclusion):

অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস একটি নদীর নাম একাধারে এক করুণ জীবননাট্য, সমাজ-সংস্কৃতির অন্তর্লিখন ও নারীমনের অজস্র দ্বন্দ্বের শিল্পরূপ। উপন্যাসটি নদীর মতোই প্রবাহিত হয়—মৌন, গভীর, তবু নিরন্তরভাবে বেদনার বহনকারী। নারীর নামহীনতা, মাতৃত্ববোধ, প্রত্যাশা ও প্রত্যাখ্যান—সব কিছুই যেন বাঙালি নারীর আত্মপরিচয় সংকটের কাব্যিক রূপ। নদীর জল যেমন একদিন শুকিয়ে যায়, তেমনি সমাজের নারীব্যবস্থা, সংস্কৃতির আবরণ ও সম্পর্কের আশ্রয়ও একে একে ঝরে পড়ে। এই উপন্যাস তাই শুধু একটি সময়ের গল্প নয়, এটি একটি জাতিসত্তার নিঃশব্দ বিলুপ্তির শোকসংগীত। সেই সংগীতের প্রতিধ্বনি আজও পাঠকের হৃদয়ে বেজে ওঠে, একটি নদীর নামের মতো—নীরব অথচ চিরস্মরণীয়।

তথ্যসূত্র (Work Cited):

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর। দেজ পাব্লিশিং, পঞ্চম সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৩ (কার্তিক ১৪১০), পৃ. ৩২২।

২। বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমেলা। “নামহীনতা ও নারী পরিচয়ের সংকট।” তিতাস একটি নদীর নামঃ উপন্যাসেরও, সম্পাদনা: হীরেন চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, রাস পূর্ণিমা ১৪০৭, পৃ. ১৭৪–১৭৫।

৩। চট্টোপাধ্যায়, হীরেন, সম্পাদক। তিতাস একটি নদীর নামঃ উপন্যাসেরও। “তিতাস একটি নদীর নামঃ প্লটের বিচিত্র বিন্যাস” শীর্ষক প্রবন্ধ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, রাস পূর্ণিমা ১৪০৭, পৃ. ১৯০–১৯১।

৪। —. তিতাস একটি নদীর নামঃ উপন্যাসেরও। “তিতাসের অনাম্নী অঙ্গনা” শীর্ষক প্রবন্ধ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, রাস পূর্ণিমা ১৪০৭, পৃ. ১৭৪।

৫। মল্লবর্মণ, অদ্বৈত। *তিতাস একটি নদীর নাম*। মাইতি বুক হাউস, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১১৮–২৫৭ (বিভিন্ন উদ্ধৃতির উৎস)।

৬। মল্লবর্মণ, অদ্বৈত। তিতাস একটি নদীর নাম। মাইতি বুক হাউস, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১১৮–২৫৭ (বিভিন্ন উদ্ধৃতির উৎস: যেমন পৃ. ৫,৭, ৫৩, ১১৮-১৫৭, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৯, ২৩০, ২৪৮, ২৫৭)।

৭। মল্লবর্মণ, আদ্বৈত। তিতাস একটি নদীর নাম। সাহিত্য সংসদ, প্রথম সংস্করণ।(উদ্ধৃত পৃষ্ঠা: ১, ৪২, ৯৩, ৯৮, ১০৯, ১১৩, ১২১, ১২৮, ১৩২, ১৩৫, ১৩৮, ১৪২, ১৪৭, ১৪৯, ১৫৪, ১৬১, ১৬৫, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৮, ১৭৯, ১৮৩, ১৮৯, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৭, ২০৩, ২০৫, ২০৭, ২১০, ২১৫, ২২১, ২২২।)

৮। বিশ্বাস, অচিন্ত্য। *তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে নারী-মনস্তত্ত্বের প্রতিফলন*, পাণ্ডুলিপি (বা অভ্যন্তরীণ প্রকাশনা), উদ্ধৃত সংলাপ বিশ্লেষণে ভিত্তি: বাসন্তী ও কিশোর প্রসঙ্গ।

৯। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *মানুষের ধর্ম, স্ত্রী, মাতৃভক্তি* ও অন্যান্য প্রবন্ধ/কবিতা। বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, বিভিন্ন পৃষ্ঠা (প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃত অংশ)।

১০। পাটনী, ঈশ্বরী। *মঙ্গলকাব্য*, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য।

১১। দেবী, রাধারাণী। *নারীবিষয়ক প্রবন্ধসংকলন*, কলকাতা সাহিত্য সংসদ, পৃ. অজ্ঞাত (উক্তি: “একটা নারী যখন মা হতে চায়…” উদ্ধৃত)।

১২। বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ। *বেদিনীর আত্মকাহিনী*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

১৩। দেবী, মহাশ্বেতা। *স্তনদায়িনী* এবং অন্যান্য গল্প।

১৪। মল্লবর্মণ, আদ্বৈত। ‘তিতাস একটি নদীর নাম’, ১৯৫৬, সাহিত্য সংসদ।

১৫। মজুমদার, আশিস। ‘নদী ও সাহিত্য: বাংলার কথাসাহিত্যে নদীর প্রতিরূপ’, দে’জ পাবলিশিং, ২০০১।

১৬। Spivak, Gayatri Chakravorty. “Can the Subaltern Speak?” in ‘Marxism and the Interpretation of Culture’, Nelson & Grossberg (eds), University of Illinois Press, 1988.

১৭। Bhabha, Homi K. ‘The Location of Culture’. Routledge, 1994.

১৮। চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ। ‘আধুনিকতা, প্রান্তিকতা ও বাংলা উপন্যাস’, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১২।

সমাপ্ত